দীনবন্ধু অ্যান্ড্জ ও শান্তিনিকেতন

অশোককুমার রায়

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি চার্লস ফ্রিয়ার এ্যান্ড্জ ইংলন্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা জন এডুইন ধর্মযাজক এবং মা মেরী শ ার্লট ছিলেন উদার ধর্মশীলা নারী। রবীন্দ্রনাথের মতো এ্যান্ড্জের চৌদ্দটি ভাইবোন ছিল। এ্যান্ড্জ যাকে চার্লিও বলা হয়, তিনি নিজের পরিবার সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "One of the happiest household in the world"

এ্যান্ড্জ শৈশব বার্মিংহামে কাটিয়ে ১৮৯০ খ্রিঃ কেমব্রিজ ঝিবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে ১৮৯৫ খ্রিঃ ঝিবিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার "বানি পুরস্কারে" ভূষিত হন। ঐ সময় তিনি সেবা, প্রেম এবং প্রকৃতির প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেন। শৈশব থেকে চার্লি মায়ের মুখে ভারতের ছবি শুনতেন। ঐ সময় ১৯০৪ সালের ২০ মার্চ দিল্লিতে এসে পৌঁছেন এবং শেষে দিল্লির স্টিফেন কলেজে অধ্যাপনার কাজে দায়িত্ব নেন। তখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না। কিন্তু Modern Review পত্রিক ায় ১৯৩৯ সালে লিখেছিলেন।

"My own knowledge of the Ashram was entirely derived from pages of Modern Review and from the accounts given by Shushil Kumar Rudra and Nishi Kanta Sen as to the greatness of Rabindra Nath Tagore."

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ১৯১২ সালের ৩০ জুন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন--- "কলা বিশারদ রদেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ ছিল। কবি ইয়েটস্ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এ্যান্ড্জ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে বাসা। হ্যাম্পষ্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এ্যান্ড্জ আমার সঙ্গে নিয়েছিলেন।নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সে দিন তাও মনে করতে পারি নি।" ৩০ শে জুন ঐতিহাসিক দিনটির দিকে তাকিয়ে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--- "কবির সহিত বিলাতে তাঁহার এই সামান্য পরিচয় অল্পকালের মধ্যেই চিরজন্মের বন্ধনে পরিণত হয়েছিল।"

কবির সান্নিধ্য শেষে এ্যান্ড্জ রবীন্দ্রতীর্থে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারীআশ্রম বিদ্যালয় দেখাতে এলেন । রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেখা যায় তখন আশ্রমের ছাত্র এবং শিক্ষকগণের মধ্যে অজিত চত্রবর্তী, সন্তোষ মজুমদার পণ্ডিত ক্ষিতি মোহন সেন এবং আশ্রমের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ আদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থাকরেন। ক্ষণিক মিলনের মধ্যে এ্যান্ড্জ আশ্রমের প্রতি গভীর মমত্বে জড়িয়ে পড়েন। ঐ সময় মানবাত্মার ত্রন্দনে তিনি ছুটে গেলেন দক্ষিণ আ ফ্রিকায়। সেখানে গান্ধীর সহিত পরম সখ্যতায় আবদ্ধ হন আজীবনকাল। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী মিলনের সেতু দীনবন্ধু এন্ড্জই ।

মানব ধর্মলোকের কণ আকর্ষণ চার্লিকে কোথাও বন্দী করে রাখতে পারেনি। ১৯১৪ সালে এপ্রিলে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। নিস্তব্ধ ধ্যানের আকাশে অন্তরের পুণ্য প্রদীপ জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠলো। আর এই অন্তরাত্মাকে কবি বুকে টেনে নিলেন। ১৯ শে এপ্রিল চার্লিকে শিক্ষকতার পদে দায়িত্ব দিতেই সাদর সম্ভাষণ করে বরণ করে নিলেন সেই সম্বর্ধনা সভায় আম্রকুঞ্জের নীচে সদ্য প্রক াশিত 'উৎসর্গ' কাব্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। আর রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ডে দেখি অভ্যর্থনা উপলক্ষে কবি লিখলেন---

'প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরস ধার
হে বন্ধু, এসেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার,
হে বন্ধু, গ্রহণ করো, করি নমস্কার।'

আর ২৬ শে এপ্রিল চাঁদের আলোতে চার্লির সম্বর্ধনাতেই অভিনয় করলেন "অচলায়তন" নাটকটি

এই ধর্ম যাজক পুত্রের আশ্রম জীবনে খাওয়া - দাওয়ায় বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রমথ নাথ বিশীর লেখায় দেখি "একব ার দেখিলাম মিঃ এ্যান্ড্জ আশ্রমের সাধারণ পাকশালায় খাইতে বসিয়াছেন। তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে অন্যত্র ছিলেন। কাজেই তঁ াহার পক্ষে ইহা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আহারান্তে যে কয়খানা টি অবশিষ্ট ছিল, পকেটে লইয়া গেলেন, বোধ করি রাতেজল

যোগ হইবে।"

এছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়ার মধ্যে এ্যান্ড্রুজকে নিয়ে কত সংশয়। কিন্তু না। তিনি আশ্রমের অমৃত রস পান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তবে গ্রন্থে লিখেছেন 'চার্লির বীভৎস বিজাতীয় মূর্তির প্রতি কতো আত্ম ধিক্কার এবং শান্তির জন্যে প্রার্থনায় কাতর।'

আশ্রমের বড়দা, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা পূর্বে বলেছি। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম ছেড়ে যেতে বড়দাকে প্রণাম করে যেতেন, আবার যখন ফিরতেন, তখন প্রণাম করে আশীর্বাদ কামনা করতেন। তেমনি এ্যান্ড্রুজ সাহেবও, এমন কি বৃদ্ধ বড়দাকে ঠেলা রিক্সায় বসিয়ে আশ্রমের কাজ কর্ম দেখাতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড্রুজ গ্রন্থাবলীতে লিখেছেন 'বড় জনের প্রতি চার্লির শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।'

প্রমথনাথ বিশী আরেক জায়গায় লিখেছেন, "একবার তাঁহার এক পায়ে ঘা হইয়াছিল, সেই এক পায়ে জুতা পরিতে পারিতেন না। কিন্তু অন্য পায়ে জুতা ছাড়িলেন না। এক পায়ে জুতা পরিয়া সারা আশ্রম ঘুরিয়া বেড়াইতেন।"

এখানে স্পষ্ট করে বলতে হচ্ছে, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মধ্যে তফাৎ কি? রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্ব - নাগরিক হয়ে উঠলেন। আর ১৯১৮ সালে ৭ই পৌষ আশ্রমে বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। মিঃ এ্যান্ড্রুজ দেখলেন আশ্রমে বহু শিক্ষকের বকেয়া পড়ে আছে। ঐ সময় তিনি উত্তর ভারত ঘুরে ঘুরে প্রায় ১৬,২৮৫ টাকা ব্যবস্থা করে গুদেবকে কিছুটা আশ্বস্ত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনিই ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীয় প্রথম সর্বাধ্যক্ষের জন্য মনোনীত হন এবং শিক্ষকদের ১০ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুর্মূল্যতার মধ্যেও চার্লি বিশ্বভারতীয় সাহায্যের জন্য পূর্বে জাপান, পশ্চিমে কানাডা এবং আমেরিকা ঘুরে ঘুরে আশ্রমের টাকা সংগ্রহ করে ছিলেন। ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী রেজিস্টার হলে মিঃ চার্লিই বিশ্বভারতীর জন্য এক খ্রিস্টান মহিলা ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলেন। পৃথিবীর বহু প্রান্তের বহু গুণী জনের রবীন্দ্র সান্নিধ্যের সেতু বন্ধন ছিলেন মিঃ এ্যান্ড্রুজ। পৃথিবীর বহু কোণ থেকে আশ্রমের উন্নতি কল্পে অর্থের আশ্বাস দিয়ে গুদেবকে কত উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছেন সে চিঠিগুলি আজ বিশ্ব সাহিত্যে সমাদৃত।

১৯২৬ সালে ইতালি ভ্রমণকালে ফ্যাসিস্ত পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বিকৃত করে। কবি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রতিবাদ জানান। ইতালিতে তখন বিক্ষোভের ঝড় উঠে। এন্ড্রুজই তখন গুদেবকে সন্তর্পিত সাবধানী বাণী দিয়ে সংকটের কথা জানান। ১৯২৬ সালের ১৭ আগষ্ট চার্লির লেখা এক পত্রে পাই।

"ইতালি ভ্রমণ সম্বন্ধে আপনার চিঠি পত্র যখন আসছিল ভাগ্যে সে সময় আমি তুচিচর কাছে ছিলাম। তখন সে আমাকে বিশ্বাস করে, আমার বন্ধুত্বে তার আস্থা আছে। হয়তো সে বিশ্বভারতী ছেড়ে যাবে, কিন্তু তিক্ত অপ্রসন্ন মন নিয়ে নয়।"

আশ্রমের অর্থ সংগ্রহ, শিক্ষকতা, সেবা, সার্বিক কল্যানের ইতিহাস বর্ণনা করা বড়ই কঠিন। খ্যাতনামা লেখক এবং আশ্রমের ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি 'গুদেব ও শান্তিনিকেতন' বইটিতে এ্যান্ড্রুজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "আহা, কী সুন্দর উচচারণ! এতদিন যা দুচার বার ইংরেজের মুখে ইংরেজী শুনেছি তাঁর চৌদ্দ আনা বুঝতে পারি নি। আর উনি যা বলেছেন, তার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পেরেছি।"

দক্ষিণ ভারতের এক তামিল ছেলের আশ্রমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। ছেলেটির বাবা ১৯২৩ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারি লেখা এক পত্রে জানান, এন্ড্রুজ আমার ছেলের সেবা করেছিলেন দেবদূতের মতো। বিশ্বাস করুন, ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত ছাড়া কেউ এমন পারে না। সেই খ্রিস্ট প্রীতির স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় শেষে নিশ্বাস ত্যাগ করে পুত্র আমার ধন্য হয়েছে।"

তিনি খবরাখবর নিয়ে ডাক হরকরার মতো ছুটে যেতেন পায়ে হেঁটে হেঁটে মডার্ণ রিভিউ বা বিশ্বভারতী পত্রিকায়। একবারচালি কলকাতা থেকে আসার পথে রাস্তায় কাটা তরমুজ খেয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেবায়সেদিন বুঝেছিলাম আশ্রম হয়তো জেজালেমের একটা অংশ বিশেষ। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথের লেখা 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে পাই রামগড়ে কবির সঙ্গে নিয়েছিলেন এ্যান্ড্রুজ। কবি 'বলাকার' কবিতা আবৃত্তি করেছেন, আর এ্যান্ড্রুজ কিছুক্ষণ পরেই পায়ে জড়িয়ে ধরছেন। এরূপ অদর্পের দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ দূরে রাখতে পারেন কি?

দৌড়ঝাপ ছুটাছুটি, দেশের জন্য প্রতিবাদ, উচচ পদস্ত কর্মচারীগণের সঙ্গে সাক্ষাতকার, জটিল আবরণ উন্মোচনের স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল মিঃ এন্ড্রুজের।

এন্ড্রুজ দেখলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন পারসিক, সংস্কৃত, ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান, প্রকৃতি বিষয়ক অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়েছে তেমনি বিশ্বভারতীতেও দরকার হিন্দী শিক্ষার। ১৯৩৮, ১৬ই জানুয়ারী হিন্দিভবনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান, কবি সভায় ছিলেন না। চার্লিই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি হিন্দীভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠেন। তার কিছু দিন পরেই তিনি আবার বিশ্বভারতীয় সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বিপুলা এই পৃথিবীতে কর্ম সাধনায় মানুষের কত অধিকার। পৃথিবীর যে কোনপ্রান্তে স্বাধীনতার জন্যে তিনি মুক্ত মনে প্রার্থনা করে গেছেন। বিশ্ব পরিব্রমায় তিনি ক্লান্ত। ১৯৪০ সালে ৫ই এপ্রিল শুক্রবারে কলকাতায় তাঁর দেহাবসান হয় মৃত্যুকালে শুধু একটি তামার পয়সা এবং বন্ধু সুশীল কুমার দ্রের কিছু টাকা তা ও আশ্রমের নামে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন। এগুলো সমেত তাঁর ঘড়ি সহ আরও অনেক জিনিস আজ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

জয়, পরাজয় সংশয়ে যাঁর দুটি চরণ থেমে থাকেনি, যাঁর লেখনী বিরাম পায়নি, যাঁর কর্ম প্রচেষ্টা থেমে থাকে নি, যিনি, শীতের মধ্যে

নিজের বস্ত্র দান করে ফেলতেন--- তাঁর অম্লান প্রাণশিখা কি অনির্বাণ নয়? মৃত্যুতে শোকাহত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন--
"কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তাও জানতে পারি নি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পাননি। কিন্তু ভিক্ষা উপলক্ষে অসংকোচ খর্ব করেছেন, যাকে সংসারের আদর্শ বলে আত্মসম্মান।"
আশ্রমের সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭০ সালে ১লা মার্চ এক ভাষণে বলেছিলেন---"বিশ্বভারতীর জন্যে প্রয়োজনের সময় অর্থ সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের বহু দুশিন্তার ভার লাঘব যেমন তিনি করেছিলেন তেমনি ভারতের বাইরে নানা দেশে বিশ্বভারতীয় আদর্শ প্রচ ারকরে তাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিলেন।"
'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মৈত্রেয়ীদেবী লিখেছেন "কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধূলোর - ধূসর জানা কাপড়, ধুতি খুলে খুলে পড়ছে কোন কোন সামলে সামলে চলেছে সন্ন্যাসী।" ১২৫ তম জন্ম তিথি উপলক্ষে আমার আবেদন, এ্যান্ড্রজের বৈচিত্রপূর্ণ জীবন বহু লেখকের রচনার বিষয় হবে, এই দীপ শিখাটি জ্বেলে রাখলাম। আজও আশ্রমে ১২ই ফেব্রুয়ারী দীনবন্ধু এন্ড্রজের জন্মদিন প ালনহয়। তাঁর মতো ভারত সেবক, দীনের বন্ধু, বিশ্ব মানব রবীন্দ্রভক্ত পৃথিবীতে বিরল। আশ্রমে দীর্ঘ ২৮ বৎসর শিক্ষকতা করে মুগ্ধ করেছেন বহু গুণীজনকে, কোথায় আছে এমন প্রেমিক বলুন তো? তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শিষ্য এবং বীর সুভাষের খুবই কাছের মানুষ।